ইসলামী আইন না মানার বিধান

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ইসলামী আইন না মানার বিধান:

গ্রন্থটিতে লেখক ইসলামী আইন না মানার বিধান বর্ণনা করেছেন। তারপর না মানার কারণে কি কি সমস্যা হয় তাও উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেছেন ইসলামী আইন সম্পর্কে যা কোন কোন মানুষের মনে দানা বেঁধে

আছে। তিনি দলীল ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে সে সমস্ত সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

https://islamhouse.com/৩৭৩৪২১

- ইসলামী আইন না মানার বিধান: কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর
  - ভূমিকা
  - বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
  - মূলত আল্লাহর আইন অনুসারে না চলার কয়েকটি পর্যায় হতে পারে:

- ইসলামী আইনরে তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস হলো: ইজমা‘ ও কয়িাস।
- ইসলামরে দৃষ্টতিে একজন মানুষরে মৌলকি সমস্যা পাঁচটি:

ইসলামী আইন না মানার বধিান: কছিু প্রশ্ন ও তার উত্তর

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়িা

সম্পাদনা : ড. মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী

সংক্ষপ্তি বর্ণনা.............

গ্রন্থটিতে লেখক ইসলামী আইন না মানার বিধান বর্ণনা করেছেন। আর তা না মানার কারণে কী কী সমস্যা হয় তা উল্লেখ করার সাথে সাথে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেছেন। ইসলামী আইন সম্পর্কে যাদের অন্তরে সন্দেহের দানা বেঁধে আছে লেখক দলীল ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে সে সমস্ত সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

ভূমিকা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ ٤٠﴾ [يوسف: ٤٠]

“হুকুম বা বিধান একমাত্র আল্লাহরই”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

তিনি আরও বলেন,

﴿ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٥٠]

“তারা কি তবে জাহেলিয়াতের বিধান চায়? দৃঢ়-বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে?” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহই হলেন বিধান-দাতা, আর তাঁর নিকট থেকেই বিধান নিতে হবে”।[১]

কুরআন ও হাদীসের এত সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকার পরও অধিকাংশ মুসলিম ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, শয়তান তাদেরকে বিভিন্নভাবে তা উপলব্ধি করতে দেয় না। কারণ, সে মানুষকে দু’ভাবে প্রতারিত করে হক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে:

১. কু-প্রবৃত্তিতে নিপতিত করার মাধ্যমে।

২. সন্দেহে নিপতিত করার মাধ্যমে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শয়তানি চালের বিপরীতে যা মানুষকে রক্ষা করতে পারে তা হলো, এতদসংক্রান্ত শরী‘আতের হুকুম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া

এবং আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তির ভয় দেখানো।

আর দ্বিতীয় যে অস্ত্রটি শয়তান ব্যবহার করে তার একমাত্র রক্ষা করার উপায় হচ্ছে, সে সমস্ত সন্দেহের অপনোদন যা তাকে হক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধান অনুসারে চলা আল্লাহর ওপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যা বিশ্বাসের দিক থেকে আল্লাহর রবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) একত্ববাদ, আর আমল করার দিক থেকে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে (ইবাদাতে) একত্ববাদ।

যার অনুপস্থিতিতে কারো ঈমানই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখলেও দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষাভাষী অনেকেই এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না। তাদেরকে আল্লাহর বিধান মানা বা না মানা সংক্রান্ত সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ আমার এ প্রয়াসকে কবুল করার মাধ্যমে যদি আমার জাতিকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের তাওফীক প্রদান করেন, তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়িা

বসিমলি্লাহরি রহমানরি রাহমি

আমরা নজিদেরেকে মুসলমি দাবি করে থাকি, অথচ যখনই ইসলামী বধিান ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নরে কথা আসে তখনই আমাদরে মত ও পথ বভিন্নি হয়ে যায়। এর কারণ হসিবেে আমরা বশে কয়কেটি দকি চহ্নিতি করতে পারি।

১. ইসলামী আইন বাস্তবায়নরে হুকুম কী তা না জানা।

২. ইসলামী আইন বাস্তবায়নরে হুকুম কী তা জানা সত্ত্বওে কতপিয় সন্দহে

আমাদেরে মনে দানা বেঁধে থাকে, যা আমাদেরকে তা বাস্তবায়নেরে পথে বাধা দেয়ে।

প্রথমত: যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়নেরে হুকুম জানে না, তারা দু ভাগে বিভক্ত:

ক) তাদেরে অনেকেই ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, সে সম্পর্কেই অজ্ঞ। তাদেরে অনেকেই জানে না ইসলামে যাবতীয় বিষয়েরে সমাধান আছে। মনে করে ইসলাম শুধুমাত্র কালেমার মৌখিক উচ্চারণ, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজেরে মধ্যে সীমাবদ্ধ। কালেমার অর্থই তারা জানে

না, জানতে চেষ্টা করে না। কেননা কালেমার অর্থই হলো: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, হক কোনো মা‘বুদ নেই। আর মা‘বুদ শব্দের অর্থ হলো: নির্দ্বিধায় যার ইবাদাত করা হয়, যার কথা মানা হয়, যার হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হয়, যার কথা ও নির্দেশ অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধান্য পায়।

এ সমস্ত লোকদের জন্য প্রয়োজন দীন সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করা, প্রচুর পরিমাণে দীনি বই-পত্র পাঠ করা। কুরআন অধ্যয়ন করা, হাদীস অধ্যয়ন করা, সিরাতে-রাসূলের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

চর্চা করা, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আর তখনই তারা জানতে পারবে যে, যাকে তারা রব বা পালনকর্তা হিসেবে মানে তাঁর রুবুবিয়্যাতের শর্ত হলো, তিনি তাঁর ‘মারবুব’ বা যাদেরকে পালন করবেন তাদেরকে শুধু সৃষ্টি করার দ্বারাই রুবুবিয়্যাতের দায়িত্ব শেষ করে দেন না, বরং দুনিয়ার বুকে তাদেরকে লালন-পালনের পাশাপাশি দুনিয়াতে তারা কীভাবে নিজেদের মধ্যকার যাবতীয়

কাজ তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে পরিচালিত হবে, কীভাবে তাদের মধ্যকার সৃষ্ট অপরাধসমূহের প্রতিকার হবে তারও সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং

রুবুবিয়্যাত বা পালনকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ হলো বান্দাকে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নীতি অনুসারে চলতে দেওয়া এবং সে অনুযায়ী আইন ও বিধানাবলি দেওয়া। তাই সে আইনের বিরোধিতা করে চললে আল্লাহকে রব মানার ক্ষেত্রে ছেদ পড়ে। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে মানা হয় না। আল্লাহ তা‘আলা তাই বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ “হুকুম বা বিধান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০, ৬৭]

কেননা তিনিই তো রব, সুতরাং আইনও দিবেন সেই রবই, অন্য কাউকে যদি আইন প্রদানের মালিক মনে করা হয়

তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই রব মানা হয়; যা প্রকাশ্য বড় শির্ক। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন মানবে তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: ٥٠]

“তারা কি জাহেলিয়াতের আইন চায়? দৃঢ়বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুম-বিধান দাতা আর কে হতে পারে?” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০]

এখানে জাহেলিয়্যাতের আইন বলতে আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত আইন ছাড়া

যাবতীয় আইনকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রণীত আইনের বাইরে যত প্রকার মানব রচিত আইন রয়েছে, তার সবই জাহেলী আইন, যেমন ইংরেজদের রেখে যাওয়া আইন, রোমান আইন ইত্যাদি।

খ) আরেক ধরনের লোক আছে যারা জানে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, কিন্তু তারা জানে না যে, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের হুকুম কী? তাদের অনেকেই মনে করে যে, ইসলামী আইন গতানুগতিক আইনের মত। এর বাস্তবায়নের বিরোধিতা করলে তাদের ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা ইসলামকে নিছক কিছু

কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে থাকে।

এ সমস্ত লোকদের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো, ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা তাদের অনেকেই জানে না যে, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না করা কুফুরী, যা ঈমান নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

“আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করে না,

তারা কাফির। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾ [المائدة: ٤٥]

“আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করে না, তারা যালিম।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৫]

আরও বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧﴾ [المائدة: ٤٧]

“আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করে না, তারা ফাসেক।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৭]

মূলত আল্লাহর আইন অনুসারে না চলার কয়েকটি পর্যায় হতে পারে:

১) আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনে বিচার-ফয়সালা পরিচালনা জায়েয মনে করা।

২) আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা উত্তম মনে করা।

৩) আল্লাহর আইন ও অন্য কোনো আইন শাসনকার্য ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের মনে করা।

৪) আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য কোনো আইন প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোক্ত যে কোনো একটি কেউ বিশ্বাস করলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে।[২]

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর আইনের বিরোধী দ্বিতীয় দলটি ইসলামী আইনের জ্ঞান রাখে, তারা জানে যে, ইসলামী আইন অনুসারে না চললে কুফুরী হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে দু’টি ধারা কাজ করছে:

ক. তাদের এক শ্রেণি মনে করে ইসলামী আইন বর্তমান যুগের সাথে অসামঞ্জস্যশীল এবং অচল। তাদের অন্তরে রয়েছে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ।

তাদের সন্দেহের মধ্যে যা যা তারা বলে থাকে তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান:

১) ইসলাম এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান; উভয়টি পরস্পর বিরোধী।

২) কেউ কেউ মনে করে যে, বর্তমানে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব নয়, জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়াই

জরুরি। আর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র আল্লাহর আইন অনুসারে চলতে পারে না। কেননা জাতি হিসেবে প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি কালচার রয়েছে।

৩) কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধান আধুনিক যুগের উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অপারগ।

৪) কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধান মানেই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৫) কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধান মানুষের বাক-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে। তেমনিভাবে চিন্তার স্বাধীনতায় বাধ সাধে। আর তা প্রগতির অন্তরায়।

৬) আবার কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ, একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের, দলের ও মতের লোক থাকে। সবাইকে একই আইনে কীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব?

৭) আবার কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধানে রয়েছে কঠোরতা, সমাজের মধ্যে ক্লীব, বিকলাঙ্গের জন্ম দেয়, তদুপরি নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও মানুষ হত্যার মতো জঘন্যতম কাজের বিস্তৃতি ঘটে।

উপরোক্ত সন্দেহগুলোর অপনোদন সংক্ষেপে ও বিস্তারিত দুভাবে করা যেতে পারে; নিম্নে তা দেওয়া হলো:

সংক্ষিপ্ত উত্তর: এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: কেউ যদি আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মানে তাহলে অবশ্যই একথা তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দার জন্য কোনটি উপযোগী আর কোনটি অনুপযোগী সেটা ভালো করেই জানেন। আর জানেন বলেই তিনি এমনভাবে এ সমস্ত বিধান প্রদান করেছেন যাতে বান্দার জন্য এগুলো কোনো রকমের সমস্যা সৃষ্টি না করে। সুতরাং এ সমস্ত সমস্যাবলির

উত্থাপন করার অর্থই হলো,
আল্লাহর প্রভুত্বরে ওপর সংশয়-
সন্দহে পোষণ করা।

অনুরূপভাবে কউে যদি আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
সর্বশষে রাসূল ও শরী‘আত
বাস্তবায়নকারী, আইনরে সঠকি
ব্যাখ্যা-দাতা, পূর্ববর্তী সমস্ত
শরী‘আতরে রহতিকারী এবং তনিি যা
নয়িে এসছেনে তাকে পরপিূর্ণ মনে করে
থাকনে, তবে তার মধ্যে এ ধরনরে
প্রশ্নরে সৃষ্টইি হতে পারে না। তাই এ
ধরনরে প্রশ্ন সৃষ্টরি মানইে হলো,
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে সর্বশষে রাসূল, তাঁর

প্রবর্তিত বিধানকে সর্বশেষ বিধান এবং তাঁর শরী‘আত সম্পূর্ণ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করার শামিল।

আর যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করবে, সে সত্যিকার অর্থেই ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

আর এটাও জানতে হবে যে, এসব বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে অশান্তি, অরাজকতা ও উপরোল্লিখিত সমস্যাসমূহ দেখা দেয় না; বরং এটা ধ্রুবসত্য যে, পৃথিবীর যেখানেই কিছু শান্তি রয়েছে বা ছিল তা ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের বিনিময়েই

ছিল। কেননা এ বিধান দিয়েছেন মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা, যেহেতু তিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাদের চলার জন্য প্রকৃত বিধান তারই পক্ষ হতে হওয়া উচিৎ। আর এটাই যুক্তিপূর্ণও; কেননা মানুষ নিজের কল্যাণ ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে না।

উপরোক্ত সন্দেহসমূহের বিস্তারিত উত্তর নিম্নরূপ:

প্রথম সন্দেহ: এ দাবি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীন পরস্পর বিরোধী।

তাদের এ দাবি খণ্ডনে বলা যায় যে, দীন বা ধর্ম বলতে যদি আল্লাহ তা‘আলা

প্রবর্তিত দীন না বুঝিয়ে জাগতিক কোনো দীন বুঝিয়ে থাকে তবে সন্দেহ ঠিক হতে পারে। কেননা সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে না। কিন্তু যদি দীন/ধর্ম বলতে ইয়াহূদী, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্ম বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তাও কোন কোন ব্যাপারে বিশুদ্ধ হতে পারে। কারণ, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী কেউই তাদের বর্তমান আইন-কানূনসমূহকে আল্লাহ প্রদত্ত এবং তাদের রাসূল-প্রদর্শিত বলে প্রমাণ করতে পারবে না। তাদের ধর্মে হয়েছে বিভিন্ন প্রকার বিকৃতি, ধর্মের নামে কু-সংস্কারের ব্যাপক প্রসার। সর্বোপরি তাদের পাদ্রীগণ

শাসকগোষ্ঠীর সাথে একজোট হয়ে ধর্মকে মানুষের ওপর অত্যাচারের হাতিয়ার বানিয়েছে। জ্ঞানীদের করেছে লাঞ্ছিত করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ যখনই কোনো বিজ্ঞানীকে কোনো কিছু আবিষ্কার করতে শুনতেন, তখনই তাদেরকে ধর্মদ্রোহিতার দোষে দোষী করে কঠোর শাস্তি দিতেন, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দানেও পিছপা হতেন না। আবার কোনো কোনো এলাকার মানুষ ছিল গির্জার প্রজাস্বরূপ। তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু ছিল না। সুতরাং কেউ যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধিতা বলতে এ

সমস্ত বিকৃত ধর্মসমূহকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বলার কিছু থাকে না। কেননা এসব বিকৃত ধর্ম মানবতার জন্য জীবন ব্যবস্থা হতে পারে না।

কিন্তু ইসলাম এমন একটি দীন যা এ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, প্রথমত ইসলামী আইনের প্রধান দু'টি উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। কুরআনের কথাই ধরা যাক, আল্লাহ তা'আলা এর হিফাযতের ভার নিয়েছেন, তাই আজ পর্যন্ত এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন প্রমাণ করে কেউ দেখাতে পারে নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ক্ষেত্রেও কথাটি বলা যায়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোকে হিফাযত করেছেন, ফলে মিথ্যা ও জাল হাদীসের প্রবর্তনকারীদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো মিথ্যা হাদীসকে কেউ সঠিক হাদীস বলে মেনে নেয় নি; বরং মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এজন্য আল্লাহ তা‘আলা এমন কিছু মুহাদ্দিস প্রেরণ করেছেন যারা সঠিক হাদীসকে জাল/মিথ্যা হাদীস থেকে পৃথক করে

গেছেন। আর তা হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“অবশ্যই আমরা এ যিকির অবতীর্ণ করেছি, আর আমরাই এর হিফাযতকারী”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯] এখানে যিকির দ্বারা কুরআন ও সহীহ হাদীস বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের গ্রন্থ ও তাদের নবীর বাণী সম্পর্কে এ রকম ঘোষণা দেন নি।

ইসলামী আইনের তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস হলো: ইজমা‘ ও কিয়াস।

ইজমা হলো: এ উম্মতের দীনি জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাহিদদের ঐকমত্য পোষণ। আর এর ভিত্তি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস- “আমার উম্মত কখনও ভ্রষ্ট পথে একমত হবে না”।[৩] সুতরাং উম্মতের সবাই যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমতিক্রমেই হবে। আর তা হবে গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী কোনো দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের নবীর মুখ থেকে এরকম কোনো অভয়বাণী শোনানো হয় নি। ফলে তাদের সবাই একমত হলেই সে মতটি সঠিক হওয়ার গ্যারান্টি নেই।

ইসলামী শরী‘আতরে (আইনরে) চতুর্থ উৎস হলো কয়িাস: যা নর্িভর করে পূর্ববর্তী তনিটি উৎসরে ওপর। সুতরাং এটাও মনগড়া কছিু নয়।

অতএব, আমরা বুঝতে পারছি যে, ইসলাম এমন একটি দ্বীনরে নাম, যা সম্পূর্ণভাবে অবকিৃত রয়ছে। আর তার বধিানসমূহে বাইররে কোনো প্রভাব সখোনে পড়ে না। যহেতেু আল্লাহ তা‘আলাই এ বধিান দয়িছেনে, আর জ্ঞান-বজি্ঞানও তাঁর পক্ষ থকেইে দওেয়া নয়োমত বশিষে, সহেতেু এ দু’টি কখনও পরস্পর বরিোধী হতে পারে না। বাস্তবওে তা ঘটে না। আল্লাহর কুরআনরে কোনো আয়াত, রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সহীহ হাদীস বিজ্ঞানে-পরীক্ষিত কোনো ধ্রুবসত্যের বিরোধী হয়েছে- এমন কোনো প্রমাণ আজও কেউ দিতে পারে না। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনো কোনো থিওরি প্রাথমিকভাবে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে বিরোধী হয়েছে এমন মনে হয়ে থাকে, তথাপি সেখানে আল্লাহর কুরআন ও সহীহ হাদীসই মূলত গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ এ সমস্ত প্রাথমিক থিওরি (যা পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি তা) পরিবর্তনশীল। আল্লাহর কুরআনের

কোনো আয়াত, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সহীহ হাদীস পরিবর্তনশীল নয়। হাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে অনেকেই সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে দরকার প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে ফিরে যাওয়া।

আর ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করেছে, জ্ঞান অর্জনকে ফরয করেছে। অন্যান্য ধর্মের মত নিরুৎসাহিত করে না। ইসলামে বিজ্ঞানীদের যে কদর আছে, অন্যান্য ধর্মের সাথে এর কোনো তুলনাই চলতে পারে না। সুতরাং দীন (ইসলাম)

এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর তাই ইসলামী বিধান বাস্তবায়নে এ সন্দেহের অবতারণা করা বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয় সন্দেহ: বর্তমান যুগ জাতীয়তাবাদের যুগ, প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারনা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া উচিৎ। ইসলামী আইন চললে তা জাতীয়তাবাদের রীতিনীতি বিরোধী হতে বাধ্য।

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দু'ভাবে দিতে পারি:

এক) একজন ঈমানদার কখনও এ রকম অযৌক্তিক কথা বলতে পারেনা, কারণ

সে জানে যে, ইসলাম গ্রহণের পর তার পরিচয় হলো সে একজন মুসলিম। তার জাতীয়তাবাদ হবে ইসলামী জাতীয়তাবাদ। শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য কোনো দেশের অধিবাসী তা উল্লেখ করতে পারে। বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি, চাল-চলন ইত্যাদিতে সে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য।

দুই) মূলত জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ইসলামী আইন থেকে দূরে সরে থাকা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, আমরা জানি প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কতগুলো জাতি থাকে, প্রত্যেক জাতির জন্য আলাদা আইন কেউই রচনা করে

না। রাষ্ট্র একটি হলে তার আইন এক রকমই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: পাকিস্তানে বেলুচি, সিন্ধি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতি রয়েছে, ভারতেও রয়েছে তদনুরূপ বহু জাতি; প্রত্যেকের জন্য আইন একটাই, ভিন্ন ভিন্ন আইন তৈরি হয় না। তাই আল্লাহর আইন চললে সেখানে জাতি-ভিত্তিক কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পরন্তু তাতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে একই নিয়মে পরিচালনা করা সম্ভব; যা রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উপকারী।

অতএব, আল্লাহর আইন মূলত কোনো জাতির জন্য বিশেষভাবে প্রণয়ন করা

হয় না, যাতে এ-ধরনের সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মূলত গোটা মানব সমাজের জন্য আল্লাহর আইনই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, তাই জাতীয়তাবাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কখনো ইসলামী আইনের বিকল্প হতে পারে না; বরং যেহেতু একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির অবস্থান সেহেতু সেখানে গোটা মানবতার জন্য প্রণীত জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা দরকার, যাতে জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে গোটা মানবগোষ্ঠী আইনের সুবিধা লাভ করতে পারে।

তৃতীয় সন্দহে: ‘ইসলামী আইন আধুনকি যুগরে উদ্ভূত বভিনি্ন সমস্যা সমাধানে অপারগ’। মূলত এটি একটি মথি্যা অপবাদ ছাড়া আর কছিুই না। কারণ, কউেই এমন কোনো সমস্যা দখোতে পারবে না যার জন্য ইসলাম কোনো হুকুম নরি্ধারণ করে দয়ে না। হাঁ, অনকে সময় অনকেরে কাছে তা স্পষ্ট থাকে না, আর সে জন্য ইসলামী আইনরে প্রতি দোষারোপ না করে এমন লোকদরে সাহায্য নয়ো উচতি যারা যকোনো উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কল্পে সঠকি সমাধান বরে করে দতি পারনে। এ রকম অস্পষ্টতা শুধু ইসলামী আইনরে বলোয় নয়, অন্যান্য আইনওে

রয়েছে; বরং অন্যান্য আইনে অসংখ্য অস্পষ্টতা বিদ্যমান। যদি অন্যান্য আইন শেখানোর জন্য, আইনগত পরামর্শ নেয়ার জন্য, আইনের ব্যাখ্যা দানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি থাকতে পারে, তাহলে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রেও এরকম শিক্ষা প্রদান, পরামর্শ প্রদান ও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্ধারণ করলেই সে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বস্তুত ইসলামী আইনের সাথে অন্যান্য আইনের অস্পষ্টতার কোনো তুলনাই চলে না।

এর একমাত্র কারণ হলো : ইসলামী আইন প্রথমে যে কাজটি করেছে তা

হলো- একজন মানুষের জীবনে কী কী সমস্যা হতে পারে তা নির্ধারণ করেছে, তারপর সেগুলোকে কীভাবে সমাধান করা যায় তার বর্ণনা দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের মৌলিক সমস্যা পাঁচটি:

(১) জীবন-নাশের আশংকা।

(২) সম্পদ হারানোর আশংকা।

(৩) মানসম্মান বা ইজ্জত নষ্টের আশংকা।

(৪) ‘আকল বা বুদ্ধি বিবেক হারানোর ভয়।

(৫) দীন বা ধর্ম বিনষ্টের আশংকা।

এই সবগুলোকে “অতীব প্রয়োজনীয় পাঁচটি বস্তু” নামে ইসলাম অভিহিত করেছে। এ পাঁচটি বস্তুরই সমাধান ইসলামী আইনে রয়েছে। ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক যুগেও এ পাঁচটি মৌলিক সমস্যার বাইরে আর মৌলিক কোনো সমস্যার উৎপত্তি হয় না। ফলে, যে সন্দেহ তোলা হয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই।

এ সন্দেহ যে সম্পূর্ণভাবে অমূলক, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা বর্তমান সৌদি আরবের আইনের কথা উল্লেখ করতে পারি, সেখানে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত রয়েছে, সে দেশে এখনো

আইনি কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। তাদের কাছে এমন কোনো মুকদ্দমা এখনও পেশ হয় নি যার জন্য তারা ইসলামী আইনে সমাধান পায় না। বরং সে দেশে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনে করে থাকে বলে এখনও সেখানে যারা থাকে তারা শান্তিতে বসবাস করে যাচ্ছে।

চতুর্থ সন্দেহ: ‘ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে’। এ সন্দেহটি মূলত ইসলামী আইন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাবেই সৃষ্ট। কেননা, ইসলামের সোনালী যুগে ইসলামী আইন পরিপূর্ণভাবেই

বাস্তবায়িত ছিল, অথচ সেখানে একনায়কতন্ত্রের নমুনা দৃষ্ট হয় না; বরং তার বিপরীতটি দেখা গেছে। আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের সময়ে খলিফাদেরও জবাবদিহী করতে হত। তাদেরও “শূরা” (পরামর্শ) বোর্ড ছিল। তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। যদিও পরামর্শ দান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া না হওয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়।

তবে হ্যাঁ, ইসলামে এমন কিছু কর্মকাণ্ড আছে, যা স্থায়ী, যেখানে

কোনোরূপ পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে অনেক বিষয় আছে যা যুগের চাহিদা অনুসারে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। আর ঐ নির্দিষ্টসমূহ (যেগুলোতে কোনো প্রকার হেরফের করা যায় না) তা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিন কর্তৃক নির্ধারিত। তাই সেখানে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

পঞ্চম সন্দেহ: ‘ইসলামী বিধান মানুষের বাক-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে। তেমনিভাবে চিন্তার স্বাধীনতায় বাধ

সাধে। আর তা প্রগতির অন্তরায়।’ এটি মূলত তিনটি সন্দেহের সমষ্টি।

এক) প্রথমেই বাক-স্বাধীনতা না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এ কথা ভালোভাবেই প্রত্যেক ঈমানদারের জানা উচিৎ যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো আইন থাকলে সেখানে বাক-স্বাধীনতা দিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ, বাক-স্বাধীনতা সাধারণত মানব রচিত আইনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। কেননা, মানব রচিত আইনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ফাঁকি, যুলুম, অত্যাচারের সম্ভাবনাসমূহ বিদ্যমান। সেখানে বাক-স্বাধীনতা ব্যবহারের

মাধ্যমে সংশোধনের পথ সুগম করা যায়। পক্ষান্তরে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের আইনের ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতা দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহকে অপরিপক্ব, অপরিণামদর্শী, যালেম, মূর্খ ইত্যাদি কুফুরী করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। কেননা, তিনি জেনে-বুঝেই বান্দার জন্য এগুলো প্রবর্তন করেছেন।

দুই) চিন্তার স্বাধীনতা না দেওয়া। মূলত এটা একটা অপবাদ; বরং ইসলামই মানুষকে চিন্তা করার, গবেষণা করার ও ভাবার জন্য উৎসাহিত করেছে। কিন্তু যেহেতু মানব চিন্তা বহুমুখী এবং শতধাবিভক্ত হতে বাধ্য, তাই ইসলাম

সে ব্যাপারে একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এমন চিন্তা করতে বলেছে, যাতে সুফল আশা করা যায়, নিষ্ফল চিন্তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করতে নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু স্রষ্টার ব্যাপারে চিন্তা করতে নিষেধ করেছে, কারণ তারা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের চিন্তার ফসল তাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কারণ, তাদেরকে এ ব্যাপারে যতটুকু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর বাইরে তারা শত চেষ্টা করেও কোনো কিছু উদ্ধার করতে

পারবে না; বরং বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হতে বাধ্য।

আল্লাহর আইন যেহেতু তার একান্ত নিজের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত বিধান, সেখানে চিন্তা করার কিছু নেই। সেখানে চিন্তা করলে শুধু প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রের সম্পর্কে করা যায়। মানা না মানার ক্ষেত্রে নয়।

মূলত যারা বলে ‘ইসলামী আইন স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা’ তারা আসলে তাদের নিজেদের চিন্তাধারাকে আইন বলে চালাতে চেষ্টা করে, সবার চিন্তাধারাকে তারা গ্রহণ করে না। তাদের চিন্তাধারার যথার্থতা নিরূপণের

একটা মাপকাঠি দরকার। আজ পর্যন্ত মানব রচতি আইনরে এমন কোনো ধারা নইে যার মধ্যে দশে-কাল ভদে, চন্িতাধারার পরবির্তনে পরবির্তত িহয় না। এতইে এর অসারতা প্রমাণতি হয়।

তনি) ইসলামী আইন প্রগতরি অন্তরায়। এ সন্দহেটি অলীক ও ভুল চন্িতাধারার ওপর প্রতষ্ঠিতি। কনেনা প্রগতি শব্দরে অর্থ যদি উন্নতি হয় তাহলে ঈমানদার মাত্রই বশ্বিাস করতে বাধ্য য,ে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামনি যা বান্দার জন্য নর্িধারণ করে দয়িছেনে, তাতইে রয়ছেে উন্নতি, সটোর পরপিূর্ণ বাস্তবায়নই হলো প্রগতি। ইসলামরে কোনো আইন আধুনকি আবষি্কৃত

কোনো কিছুর বিরোধিতা করে না; বরং এগুলোর যত ভালো দিক আছে তা গ্রহণ করা জরুরী মনে করছে, কিন্তু যদি প্রগতি বলতে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, অশ্লীলতা, নগ্নতা ইত্যাদি বুঝানো হয়, তাহলে প্রত্যেক বিবেকবানকেই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এগুলো কি উন্নতি না অবনতি? যদি এগুলো উন্নতির সোপান হতো তাহলে এ ব্যাপারে বিবেকবানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা যেত না, অথচ সুস্থ বিবেকবান মাত্রই নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে এগুলোকে দূরীভূত করা গর্বের বিষয় মনে করে থাকে। সুতরাং ইসলাম প্রগতির অন্তরায় এ রকম

অপবাদ বিকৃত মস্তিষ্কের ফসল মাত্র।

ষষ্ঠ সন্দেহ: ‘ইসলামী আইন কীভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব অথচ একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক বিদ্যমান’?

এ সন্দেহটিও অন্যান্য সন্দেহের ন্যায় অমূলক, ইসলামী আইনের প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা আছে। যদি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ থাকেন এবং তাদের মাঝে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন প্রত্যেক নাগরিকই তার বিশ্বাসকৃত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে চলতে পারবে, কারো ব্যাপারে জোর করা হবে না।

তাদের মধ্যকার সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে তাদের যদি নির্দিষ্ট আইন থাকে, তবে সে অনুসারে ফয়সালা করা হবে। তবে যেখানে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে সমস্যা দেখা দিবে সেখানে ইসলামী আইন প্রাধান্য পাবে। সুতরাং একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকলেও ইসলামী আইন প্রবর্তনে কোনো বাধা নেই।

সপ্তম সন্দেহ: ‘ইসলামী আইনে কঠোরতা আছে বলে দাবি করা’।

এ সন্দেহটিও মূলত ইসলামী আইন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকার ওপর প্রমাণবহ। কেননা ইসলামী

আইনের যে অংশের প্রতি তাদের এ সন্দেহ নির্ভরশীল তা হলো, দণ্ডবিধি অংশ। ইসলামী আইনের দণ্ডবিধি অংশের উদ্দেশ্য হলো: “প্রতিরোধ করা”; সমাজ থেকে অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা। বিকলাঙ্গ মানুষ তৈরি এর উদ্দেশ্য নয়। এক চোরের হাত কাটলেই আপনি দেখতে পাবেন সেখানে চুরি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি বিচারের প্রক্রিয়ায় রয়েছে চুরি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র অনুমান বা দাবির মুখে এ বিধান কার্যকর করা হয় না, তার উপরে আছে চুরি-করা সম্পদের পরিমাণ কত হবে তা নিরূপণ করা, নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত

চুরি করলেই শুধু হাত কাটা যাবে তার আগে নয়। আবার দেখা হবে কোত্থেকে চুরি করেছে, সে কি এমন স্থান থেকে চুরি করেছে যা কারো সংরক্ষিত বলে বিবেচিত, আবার এটাও দেখার বিষয় হবে যে, সে চোর নিতান্ত পেটের দায়ে চুরি করেছে কি না, দুর্ভিক্ষে মানুষ দিশেহারা কি না, মানুষের ন্যূনতম খাবারের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছে কি না? এ-সব বিবেচনায় রাখার পর যদি চুরি প্রমাণিত হয়, তবে তার ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটার হুকুম ইসলামী আইন দিয়েছে। যে কেউ এ রকম হাত-কাটা লোক দেখবে তার চুরির সাধ মিটে যাবে, ইসলামী আইনের

বাস্তবায়ন হয়েছে শুনতে পেয়েছে সেখানে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ কেউই চুরির কারণে নিজের মূল্যবান হাতটি যেমনি খোয়াতে চায় না, তেমনি আবার খোয়াতে চায় না নিজের সম্মান, কারণ তার হাত-কাটা অবস্থা তার জন্য যেমনি শিক্ষা অপরের জন্যও তা শিক্ষা হিসেবে দেখা দিবে।

ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সৌদি আরব (যেখানে ইসলামী আইনের দণ্ডবিধির অংশ বাস্তবায়িত আছে) সেখানে যদি ভালোভাবে দেখা হয়, তাহলে হাত-কাটা লোকদের সংখ্যা নিতান্তই কম দেখা যাবে। হয়তো কয়েক লক্ষ লোকের মাঝে দু’একজন

দখো যাবে। এ দু’একজনরে জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা রাখা কঠনি কছিু নয়। এর বপিরীতে যে অনাবলি শান্তি বরিাজ করছে, যে অর্থনতৈকি নরিাপত্তা মানুষ পাচ্ছে, তার তুলনা আজ সারা বশি্বে নইে। অন্য কোনো প্রকার আইন বাস্তবায়ন করে এরূপ শান্তি ও নরিাপত্তার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কউে করতে পারে নি এবং পারবওে না।

আমি শুধুমাত্র চুররি ব্যাপারে ইসলামী দণ্ডবধিি আইনরে যৌক্তকিতা পশে করছি; বরং অন্যান্য সকল আইনরে ব্যাপারওে একই কথা প্রযোজ্য। এখানে কোনো প্রকার যুলুমরে

সম্ভাবনাই নেই, আর কীভাবেই বা যুলুমের সম্ভাবনা থাকতে পারে এ আইনে; যে আইনটি এমন এক সত্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যিনি বান্দাহ্‌র প্রতিটি শিরা-উপশিরা, চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোথায় কীভাবে কোনো আইন দিলে বান্দার জন্য তা হিতকর হবে, তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। কারণ তিনিই তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তাদের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে?

খ. ইসলামী আইনের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে যারা ইসলামী আইনের সঠিক জ্ঞান রাখার পরও এর

বিরোধিতা করে থাকে, তাদের মনে ইসলামী আইনের বাস্তবতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থেই এর বাস্তবায়ন চায় না।

ধরুন, তাদের মধ্যে কেউ সরকারি চাকুরীজীবী, সে ঘুষ খায়, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করে; সে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হোক এটা চাইতেই পারে না। কারণ, ইসলাম ঘুষ গ্রহীতাকে অপসারণ করতে বলেছে, সরকারি সম্পত্তির আত্মসাৎকারীকে চোর হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, সে চোরের শাস্তি পাবে। তাই বড় বড় আমলারা যারা ঘুষের মাধ্যমে, অর্থ আত্মসাতের

মাধ্যমে বড় লোক হতে চায়; তারা কীভাবে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন চাইতে পারে?

আবার ধরুণ, কেউ ডাকাতির মাধ্যমে বড়লোক হতে চায়, ইসলামী আইনে তার শাস্তি হলো এক হাত, এক পা কেটে দেওয়া। এ শাস্তি কোনো ডাকাতের জন্য সুখকর নয়, তাই ডাকাতদল কোনো দিন চাইবে না ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হোক।

ইসলামী আইনে অঙ্গহানির শাস্তি হলো তেমনিভাবে অঙ্গহানি করা, তাই যারা সমাজে অঙ্গহানি করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চায়, তারা

কোনো দিন চাইবে না ইসলামী আইন এ দেশে বাস্তবায়িত হোক।

ইসলামী আইনে হত্যার শাস্তি হত্যা, তাই যে হত্যার মাধ্যমে শত্রুমুক্ত হতে চায় (চাই তার স্ত্রী, প্রতিবেশী বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ; যে-ই হোক না কেন) সে চাইবে না ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হোক, কারণ তার শাস্তিও অনুরূপ হবে, কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং কেউ-ই নিজের জীবনের বিনিময়ে এমন কিছু অর্জন করতে চায় না।

অনুরূপভাবে সমাজে এক শ্রেণির লোক রয়েছে, যারা অন্যায়-অনাচার করে

বড়োয়। ইসলামী আইন থাকলে তাদরে বচিার হবে সুষ্ঠুভাবে, তারা অন্যায় করতে পারবে না, সুতরাং তারা চায় না ইসলামী আইন বাস্তবায়তি হোক।

সুতরাং আমাদরে কাছে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, সার্বকি শান্তরি গ্যারান্টি যদি কউে পতেে চায় তার পক্ষে ইসলামী আইনরে বকিল্প আর কছিুই নইে।

আসুন! আমরা আবার আমাদরে এ প্রয়ি যমীনরে বুকে ইসলামরে আইন ও বধিান বাস্তবায়ন করে দুনয়িা ও আখরোতরে শান্তি লাভে সমর্থ হই।

আল্লাহ আমার এ প্রচষ্টো কবুল করুন। আমনি॥

[১] আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৫; নাসাঈ, (৮/২২৬); বায়হাকী (১০/১৪৫) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

[২] এর জন্য দেখুন: শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-শাইখ প্রণীত গ্রন্থ ‘তাহকীমুল কাওয়ানীন’। তবে এ সাধারণ বিধান কোন ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফির বলা যাবে না। কারণ, কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফির বলার ব্যাপারেও ইসলাম কয়েকটি শর্ত দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে,

এক. যে কথা, কাজ বা কোনো কাজ পরিত্যাগ করা কুফুরী বলা হচ্ছে তা কুফুরী হওয়ার ব্যাপারটি কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

দুই. ব্যক্তির সাথে সে বিষয়টি সম্পৃক্ত হতে হবে।

তিন. সে ব্যক্তির কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

চার. সে ব্যক্তিকে কাফের বলার বাধাসমূহ অপসারিত হতে হবে।

উপরোক্ত শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় বাধা

দূরিভূত হওয়ার পরই কেবল কাউকে কাফির বলা যাবে। সুতরাং আমরা যেন তড়িঘড়ি করে কাউকে কাফির বলার চেষ্টা না করি।

[৩] দেখুন: মুস্তাদরাকে হাকিম (১/২০০-২০১), হাদীস নং ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০। আরো দেখুন: আবূ দাউদ (৪/৯৮), হাদীস নং ৪২৫৩; তিরমিযী (৪/৪৬৬), হাদীস নং ২১৬৭; ইবন মাজাহ (২/১৩০৩), হাদীস নং ৩৯৫০।